ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2102-2109
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.471

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও মতি জ্ঞান: 'তর্কসংগ্রহ' ও 'তত্ত্বার্থধিগমসূত্র' অবলম্বনে একটি দার্শনিক আলোচনা

দীপকুমার মণ্ডল, *ছাত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
ঝিলিক বক্সী, *ছাত্রী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 27.04.2026; Accepted: 07.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Epistemology constitutes the foundational root of the majestic tree of philosophy; it is the domain wherein the intricacies of knowledge are examined. Among the various classifications of knowledge, perceptual knowledge (pratyaksha) stands as a primary form. Through perceptual knowledge, we apprehend objects directly via sensory experience. As it is derived from immediate experience, this form of knowledge provides essential clarity to other epistemic domains. In Indian philosophy, there is a consensus among all schools regarding the acceptance of perceptual knowledge. However, there is no lack of divergence regarding the determination of its true nature. The Nyaya school, the preeminent logical tradition of Indian philosophy, demonstrates profound intellectual rigor in defining the nature of perception. It offers innovative arguments, such as conceptualizing the mind (manas) as an internal sense organ, analyzing the multifaceted relationships between senses and objects, and establishing detailed classifications of perception. Conversely, Jaina philosophy—though not exclusively categorized by its logical methodology—exhibits an equally sophisticated and subtle analytical approach to perception. Its methodology—ranging from the exclusion of the mind from the strictly sensory apparatus, to the differentiation between the perception of ordinary individuals and realized beings (siddhas), and the delineation of various levels of perceptual knowledge—is in no way inferior to that of the Nyaya school. While this discussion focuses specifically on 'matijnana'—the ordinary perceptual knowledge within the Jaina tradition—we have attempted to provide a comparative analysis of the nature and classification of perceptual knowledge, drawing from the seminal Nyaya text 'Tarkasamgraha' and the authoritative Jaina scripture 'Tattvarthadhigamasutra'.

Keywords: Pratyaksha, Nirvikalpaka Pratyaksha, Savikalpaka Pratyaksha, Mati Jñana, Avagraha, Iha, Avaya, Dharana

ভারতের সকল দর্শন সম্প্রদায়, যে জ্ঞানের গুরুত্ব বিষয়ে একমত হয়েছেন সেটি হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়কে মাধ্যম করে বিষয় থেকে পাওয়া সাক্ষাৎ জ্ঞানকে বলা হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞান সরাসরি লাভ করা হয় এবং এখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা অন্যান্য জ্ঞানের তুলনায় (অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ ইত্যাদি) কম থাকে, তাই এই জ্ঞানকে সবচেয়ে বলিষ্ঠ জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয়। এমনকি অনুমিতি আদি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুমিতির (পর্বতে আগুনের জ্ঞান) ক্ষেত্রে হেতুর (ধোঁয়া) প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল প্রধান ভিত্তি। উপমিতির ক্ষেত্রে (গবয়ের জ্ঞান) অতিদেশ বাক্যের (গো সদৃশ গবয়) প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবশ্যক। আবার শাব্দ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তির আপ্তত্ব প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। মোটকথা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবলম্বনে অন্যান্য জ্ঞানের সমৃদ্ধি হয়ে থাকে। তবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বাবলম্বীতা বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকমহলে মতৈক্য থাকলেও, এই জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য দানা বেঁধেছে। সাধারণত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সরাসরি সম্বন্ধ থেকে পাওয়া জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। কিন্তু কোনো কোনো সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়ের পরিসংখ্যান বিষয় ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি, তো কেউ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে, কেউ কেউ আবার সম্বন্ধের প্রকৃতি নিয়েও মতৈক্যে আসতে পারেননি। প্রত্যক্ষের এই বৈচিত্র্যময় বিচারভূমি থেকে ন্যায় দর্শন এবং জৈন দর্শনের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো। এখানে একটা কথা বলে রাখা শ্রেয়, প্রত্যক্ষ শব্দটি আমরা সাধারণ অর্থে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধকে বুঝবো। সেই অর্থে জৈন দর্শনে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধকে মতিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আমাদের আলোচনা ন্যায় দর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তর্কসংগ্রহ' অবলম্বনে প্রত্যক্ষের স্বরূপ ও বিভাগ এবং জৈন দর্শনের আকরস্থানীয় গ্রন্থ 'তত্ত্বার্থধিগমসূত্র' অবলম্বনে মতি জ্ঞানের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ন্যায় দর্শনের সূক্ষ্ম বিচারশৈলীর মাহাত্ম্য জগৎখ্যাত, কিন্তু মতিজ্ঞানের স্বরূপ ও স্তর সম্পর্কে জৈন দর্শনেরও বিচারশৈলী কোনো অংশে কম যায় না।

'তর্কসংগ্রহ' অনুসারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান:

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত চতুর্বিধ প্রমার মধ্যে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমা হল প্রত্যক্ষ প্রমা। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মূলত ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতমের উল্লিখিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণকে অনুসরণ করেই নৈয়ায়িক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন। তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট-ও এর ব্যতিক্রম করেননি। মহর্ষি গৌতম রচিত 'ন্যায়সূত্র'-তে উল্লেখিত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি হল "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নম্ জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্"[১]। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন অব্যপদেশ্য (অশাব্দ), অব্যভিচারী (অভ্রান্ত), ব্যবসায়ত্মক (নিশ্চিত) জ্ঞানই হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষের এই লক্ষণকে অনুসরণ করেই অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থের ৩৩ নং শ্লোকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও বিভাগ উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্"[২]। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষের এই লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করলে যে পদগুলি পেয়ে থাকি সেগুলি হল 'ইন্দ্রিয়', 'অর্থ' ও 'সন্নিকর্ষ'। এবং এই ত্রিবিধ পদের অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। 'ইন্দ্রিয়' শব্দটি 'ইন্দ্র' শব্দের সাথে 'ঘ' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ 'আত্মা' এবং 'ঘ' প্রত্যয়ের অর্থ 'সম্বন্ধী'। অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হল 'আত্মসম্বন্ধী'। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণে 'ইন্দ্রিয়' পদের এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ

গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'ইন্দ্রিয়' পদের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ আত্মসম্বন্ধী হওয়ায় শরীরও ইন্দ্রিয় পদবাচ্য হয়ে যেতে পারে। তাই এখানে 'ইন্দ্রিয়' শব্দের দ্বারা বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। বাহ্য ইন্দ্রিয় বলতে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক- কে বোঝানো হয়েছে এবং অন্তর ইন্দ্রিয় বলতে মনকে বোঝানো হয়েছে। 'অর্থ' শব্দের দ্বারা এখানে যোগ্য বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। যে কোন বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় না। যেমন- কাল, আকাশ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয় 'অর্থ' পদের বোধক নয়। অর্থাৎ, যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য, সেই বিষয়গুলি 'অর্থ' পদবাচ্য। 'সন্নিকর্ষ' পদের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও পরম্পরা সম্বন্ধকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের সাথে অর্থের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধকেই বলা হয় সন্নিকর্ষ।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ছটি ইন্দ্রিয়ের (বাহ্য ও আন্তর) সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যথার্থ বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিভাগ: প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়ার পর তর্কসংগ্রহকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন- "তদ্ দ্বিবিধম্- নির্বিকল্পকং সবিকল্পকং চেতি"[৩]। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার- নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। 'বিকল্প' শব্দটি দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যেই সাধারণভাবে বিদ্যমান। এখানে 'বিকল্প' শব্দের অর্থ হল 'বিশেষণ'। যা কোন বস্তুকে বিশিষ্ট করে, তাই বিশেষণ। দ্রব্য, নাম, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া- এই পাঁচটি বিশেষণকে বিকল্প বলা হয়েছে। সুতরাং, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হল বিশেষণযুক্ত বস্তুস্বরূপের জ্ঞান এবং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হল বিশেষণবর্জিত বস্তুস্বরূপের জ্ঞান।

নির্বিকল্পক জ্ঞান: অন্নংভট্ট নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলেছেন "নিষ্প্রকারকং জ্ঞানং নির্বিকল্পকম্"[৪] । অর্থাৎ, যে জ্ঞান প্রকার বা বিশেষণবর্জিত বস্তুর স্বরূপমাত্রকে বিষয় করে, সেই জ্ঞানই হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে প্রথমেই যে অবিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুটিকে যেহেতু বিশেষণশূন্যভাবে জানা হয়, তাই বস্তুটি কিরূপ তা জানা সম্ভাব হয় না। বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে বলা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করার জন্য ওই দ্রব্যের দিকে চক্ষু উন্মীলিত করে, তখন ওই দ্রব্যের সাথে দ্রষ্টার চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয় এবং এই সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রথমেই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হলো নির্বিকল্পক জ্ঞান। গ্রন্থকার নির্বিকল্পক জ্ঞানের কোন উদাহরণ দেননি। এর থেকে বোঝা যায় নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রকাশক কোন শব্দ নেই। সুতরাং এই জ্ঞান অপ্রকাশযোগ্য। তাই বলা হয়েছে "বালমূকাদিজ্ঞানসদৃশং নির্বিকল্পকম্"[৫]। অর্থাৎ, নির্বিকল্পক জ্ঞান হল অবোধ বালক ও মূক ব্যক্তির জ্ঞানের সদৃশ। অবোধ বালক বা মূক ব্যক্তি যেমন তাদের জ্ঞানকে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই নির্বিকল্পক জ্ঞানও অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য নয়। তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবোধ বালক জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুর নাম না জানার কারণে এবং মূক ব্যক্তি বলবার শক্তির অভাবে তাদের কোন জ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তি বা বচনপটু ব্যক্তির যদি নির্বিকল্পক জ্ঞান হয় তাহলে তা প্রকাশযোগ্য নয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞান তখনই প্রকাশযোগ্য হয় যখন জ্ঞানের বিষয়বোধক শব্দের উল্লেখ করা হয়। আর শব্দ মাত্রই তা কোনো না কোনো বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু, অবিশিষ্ট (বিশেষণশূন্য) বস্তুস্বরূপই সর্বদা নির্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হওয়াই, নির্বিকল্পক জ্ঞান যেভাবে নিজ বিষয়কে গ্রহণ করে, কোন

শব্দই সেইভাবে ওই বিষয়কে ব্যক্ত বা প্রকাশ করতে পারেনা। এই কারণেই বয়স্ক এবং বচনপটু ব্যক্তিও নির্বিকল্পক জ্ঞানকে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারেনা।

নির্বিকল্পক জ্ঞানকে যেহেতু 'বালমূকাদিজ্ঞানসদৃশ' বলা হয়েছে, তাই অনেকেই মনে করতে পারেন নির্বিকল্পক জ্ঞানে যেমন বিশেষণবর্জিত বস্তুস্বরূপই জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে, তেমনি অবোধ বালক ও মূক ব্যক্তির জ্ঞানেও কেবল বিশেষণবর্জিত বস্তুস্বরূপই জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। কিন্তু এমন বুঝলে তা সঙ্গত হবে না। কারণ নির্বিকল্পক জ্ঞান কখনোই জ্ঞাতার প্রবৃত্তির কারণ হয় না। কিন্তু অবোধ বালক ও মূক ব্যক্তির জ্ঞান অন্যান্য ব্যক্তির জ্ঞানের মতো প্রবৃত্তির কারণ হয়। সুতরাং নির্বিকল্পক জ্ঞানের মতই যদি অবোধ বালক ও মূক ব্যক্তির জ্ঞান হত, তাহলে তা কখনোই প্রবৃত্তির কারণ হতো না। তাই নির্বিকল্পক জ্ঞানের সাথে অবোধ বালক ও মূক ব্যক্তির জ্ঞানের এই অংশে মিল যে, বালমূকাদির জ্ঞান যেমন শব্দের দ্বারা অভিলাপযোগ্য নয়, তেমনি নির্বিকল্পক জ্ঞানও শব্দের দ্বারা অভিলাপযোগ্য নয়।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, যে জ্ঞানের বিষয় বিশেষণশূন্য বস্তুস্বরূপমাত্র এবং যা অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য নয়, তাই নির্বিকল্পক জ্ঞান।

সবিকল্পক জ্ঞান: নির্বিকল্পক জ্ঞানের পরক্ষণে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা হল সবিকল্পক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণে তর্কসংগ্রহকার বলেছেন "সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্"[৬]। অর্থাৎ, যে জ্ঞান প্রকারবিশিষ্ট তাই সবিকল্পক জ্ঞান। এখানে 'সপ্রকারক' বলতে দ্রব্য, নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ এবং বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধকে বোঝানো হয়েছে। যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও তদীয় সম্বন্ধ বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই সবিকল্পক জ্ঞান। অর্থাৎ, সবিকল্পক জ্ঞান হল দ্রব্য, নাম, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান। এই স্তরে জ্ঞানের বিষয়টি নিজ স্বরূপে অর্থাৎ, বিশেষ্য-বিশেষণ যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। ফলে বিষয়টি সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞান স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হয়। এই জ্ঞান প্রকাশযোগ্য। তাই এই জ্ঞানের যাথার্থ্য নির্ণয় করা সম্ভব। যা নির্বিকল্পক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সম্ভব হয় না।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজবোধ্য করা হল- যদি একজন ব্যক্তি একটি ঘট প্রত্যক্ষ করার জন্য ঘটটির দিকে চক্ষু উন্মীলিত করে, তখন ঐ ঘটের সাথে চক্ষুর সন্নিকর্ষের ফলে প্রথমেই অপ্রকাশযোগ্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। এটি হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রথম স্তর। এই স্তরে ঘটত্ব প্রভৃতি বিশেষণ যে ঘটের মধ্যে থাকে না এমন নয়, কিন্তু ঘটের বিশিষ্ট ধর্মরূপে সেগুলি এই স্তরে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু, তার পরক্ষণেই ঘটটির নাম (ঘট), জাতি (ঘটত্ব) ইত্যাদি সহকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা হল সবিকল্পক জ্ঞান। এটি হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বিতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে ঘটটি ঘটত্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট ধর্মরূপে প্রকাশিত হওয়ায় উৎপন্ন জ্ঞানটি স্পষ্ট, সুনিশ্চিত ও প্রকাশযোগ্য।

নব্য নৈয়ায়িকগণ মনে করেন নির্বিকল্পক জ্ঞান অনুব্যবসায়ের অযোগ্য, কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান অনুব্যবসায়ের যোগ্য। অনুব্যবসায় বলতে বোঝায় জ্ঞানের জ্ঞান। এই জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানের হয়ে থাকে। নির্বিকল্পক জ্ঞান যেহেতু অবিশিষ্ট জ্ঞান, তাই এই জ্ঞান থেকে অনুব্যবসায়ের উদ্ভব হয় না। অন্যদিকে, সবিকল্পক জ্ঞান যেহেতু বিশিষ্ট জ্ঞান, তাই এই জ্ঞান থেকে অনুব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। যেমন 'এটা ঘট'- এইরূপ সবিকল্পক জ্ঞানকে বিষয় করে যখন 'আমি ঘটটি জানি' এইরূপ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তখন সেই উৎপন্ন জ্ঞানটিকে বলা হয় অনুব্যবসায়।

'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' -এ মতিজ্ঞান:

জৈন দর্শনের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল উমাস্বাতীর (মতান্তরে উমাস্বামীর) 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র', যা 'তত্ত্বার্থসূত্র' নামেও জনপ্রিয়। এই গ্রন্থের শুভারম্ভই হয়েছে মোক্ষলাভের মার্গ হিসাবে ত্রিরত্নের আলোচনার মধ্য দিয়ে। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্রের ত্রিবেণী সঙ্গমেই মোক্ষসুধার প্রাপ্তি হয়। তত্ত্বার্থবৃত্তিকার আচার্য শ্রুতসাগর সম্যক্ জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন- জীবাদি জাগতিক পদার্থগুলি যে যে ধর্মবিশিষ্ট, মোহ ও সংশয়মুক্ত হয়ে পদার্থগুলিকে সেই সেই ধর্মবিশিষ্টরূপে জানাই হল সম্যক্ জ্ঞান। উমাস্বামী জ্ঞানের পাঁচটি বিভাগ দেখিয়েছেন- মতি জ্ঞান, শ্রুত জ্ঞান, অবধি জ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান এবং কেবল জ্ঞান[৭]। মতি ও শ্রুত হল পরোক্ষ জ্ঞান[৮] এবং অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান[৯]। এখানে মনে রাখতে হবে, জৈন পরিভাষায় প্রত্যক্ষ বলতে সিদ্ধ পুরুষের আত্মালব্ধ সরাসরি জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে ইন্দ্রিয় ও মন মাধ্যম হিসেবে থাকে না। সাধারণ বদ্ধ জীবেদের এই জ্ঞানের অধিকার নেই। অন্যদিকে, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মনকে মাধ্যম করে লাভ করা হয়, তাকে জৈনরা পরোক্ষ জ্ঞান বলেছেন। সাধারণ মানুষ এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। এখন আমরা যদি ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত পরিভাষা গ্রহণ করি, তাহলে পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত মতি জ্ঞানকে অন্যান্য দর্শন স্বীকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমতুল্য বলতে হয়। কেননা মতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ও মন মাধ্যম হিসেবে থেকে বিষয়ের বোধ আসে। আমরা এই সাধারণরীতি মেনেই প্রত্যক্ষতুল্য মতি জ্ঞানের স্বরূপ ও স্তরভেদ নিয়ে আলোচনা করবো।

মতি জ্ঞান: 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ১৪ নং সূত্রে মতি জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয়েছে- "তদিন্দ্রিয়ানিন্দ্রিয়নিমিত্তম্"[১০]। সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা চারটি শব্দ পাই– 'তদ্', 'ইন্দ্রিয়', 'অনিন্দ্রিয়' ও 'নিমিত্ত'। সূত্রস্থিত 'তদ্' শব্দ দ্বারা মতি জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, 'ইন্দ্রিয়' শব্দ দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক- এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়েছে, 'অনিন্দ্রিয়' শব্দ দ্বারা স্থিরতাহীন চঞ্চল মনকে বোঝানো হয়েছে, 'নিমিত্ত' শব্দ দ্বারা ভিত্তি তথা হেতুকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সূত্রটির অর্থ হল- যে জ্ঞান কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় (পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়) বা কেবলমাত্র মন বা ইন্দ্রিয় ও মন উভয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়, তাকে মতি জ্ঞান বলা হয়। বাহ্য বিষয়ের সাথে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের ফলে বাহ্য বিষয় সম্পর্কে এবং মনের সাথে আন্তর বিষয়ের সম্বন্ধের ফলে আন্তর্বিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়।

জৈন দর্শনে জীব বলতে চৈতন্য বিশিষ্ট সত্তাকে বোঝানো হয়েছে[১১]। জীবের বিভাগ হিসেবে আমরা মুক্ত ও বদ্ধ জীবের পরিচয় পেয়েছি, আবার বদ্ধ জীবের উপবিভাগ হিসাবে সমনস্ক ও অমনস্ক জীবের, আর অমনস্ক জীবের উপবিভাগ হিসাবে ত্রস ও স্থাবরের নাম পেয়েছি। সমস্ত জীবই অন্ততপক্ষে একটি এবং অনধিক পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। তাই প্রতিটি জীবের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মতি জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। পৃথিবীর, জল, বায়ু, বনস্পতি ইত্যাদি হলো স্থাবর জীব। এই স্থাবর জীবের মধ্যে কেবলমাত্র স্পর্শ নামক একটি ইন্দ্রিয় থাকে, তাই এদের মতি জ্ঞান স্পর্শ নামক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। ত্রস জীব আবার দুই ইন্দ্রিয়, তিন ইন্দ্রিয়, চার ইন্দ্রিয় এবং পাঁচ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হতে পারে। শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ত্রস জীবের স্পর্শ ও রসন ইন্দ্রিয় মতি জ্ঞানের মাধ্যম হয়। পিপীলিকা, জোঁক ইত্যাদি তিন ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবের স্পর্শ, রসন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় মতি জ্ঞানের মাধ্যম হয়। ঠিক একইভাবে মাছি, মশা সহ অন্যান্য চার ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবের স্পর্শ, রসন, ঘ্রাণ

ও চক্ষু ইন্দ্রিয় মতি জ্ঞানের মাধ্যম হয়। আর মানুষ সহ পশু-পাখিদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় মতি জ্ঞানের মাধ্যম হয়। তবে মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র মানুষেরই ইন্দ্রিয় ও মনের যৌথ উৎসের দ্বারা মতি জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়। মানুষ ছাড়া অন্য সমস্ত জীবের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা মতি জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়। কেননা, তাদের মধ্যে মনের অস্তিত্ব থাকে না।

'তত্ত্বার্থসূত্র'- এর প্রথম অধ্যায়ের **১৩** নং সূত্রে মতি জ্ঞানের বিস্তৃতি তথা পরিধি সম্পর্কে পাঠকদের অবগত করানোর জন্য উমাস্বাতী লিখেছেন- "মতিঃ স্মৃতিঃ সংজ্ঞা চিন্তাঽভিনিবোধ ইত্যনর্থান্তরম্"[১২]। অর্থাৎ, মতি, স্মৃতি, সংজ্ঞা, চিন্তা এবং অভিনিবোধ- এগুলি হলো পর্যায়বাচক শব্দ বা সমার্থক শব্দ। 'মতি' শব্দের অর্থ বিষয়ে আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি, তাই এখন স্মৃতি, সংজ্ঞা, চিন্তা ও অভিনিবোধ বলতে কি বুঝিয়েছে তা জানা গেলে মতি জ্ঞানের স্বরূপ ও পরিধি আরও স্পষ্ট হবে। 'স্মৃতি' হল পূর্বে জানা কোনো বিষয়ের স্মরণ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান। ধরা যাক, পূর্বে আমি জৈন দর্শনে কথিত জীব সম্পর্কে জেনেছি, এখন বর্তমানে যদি সেই পূর্বে জানা জীবজ্ঞানের স্মরণ হয়, তাহলে সেই স্মরণমূলক জ্ঞানকে স্মৃতি বলা হবে। 'সংজ্ঞা' শব্দের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বে জানা বিষয়ের সাথে যখন বর্তমান প্রত্যক্ষ যুক্ত হয়, তখন বর্তমান প্রত্যক্ষসহ পূর্বজ্ঞানের স্মরণ থেকে প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞানের উদয় হয়। 'চিন্তা' বলতে এখানে আরোহমূলক জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা আমরা নিয়ত ঘটতে দেখি, সেই ঘটনা সংক্রান্ত জ্ঞানই চিন্তার তাৎপর্য। 'অভিনিবোধ' বলতে এখানে অনুমানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান, স্মরণমূলক জ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞালব্ধ জ্ঞান, আরোহমূলক জ্ঞান এবং অনুমানলব্ধ জ্ঞানের একই অর্থ।

মতি জ্ঞানের স্তরভেদ: তত্ত্বার্থসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের **১৫** নং সূত্রে মতি জ্ঞানের স্তরভেদ দেখাতে গিয়ে সূত্রকার বলেছেন– "অবগ্রহেহাবায়ধারণাঃ"[১৩]। অর্থাৎ অবগ্রহ, ইহা, অবায় ও ধারণা- এই চারটি স্তরের মাধ্যমে মতি জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হয়। মতি জ্ঞানের প্রথম স্তর হল 'অবগ্রহ'। কোন বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় ধাবিত হওয়ার ফলে সেই বিষয়ের বিশেষণ অবগাহনহীন কেবল অস্তিত্বের বোধ হল অবগ্রহ। মতি জ্ঞানের এই স্তরে বিষয়ের স্বরূপের জ্ঞান হয় না, বরং তার অস্তিত্বের একটি অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মতি জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তরটি হল 'ইহা'। ইহা স্তরটিতে জিজ্ঞাসা, পরীক্ষা, বিচার ইত্যাদির কৌতূহল সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অবগ্রহ স্তরে যে বিষয়ের কেবলমাত্র অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে জানা গিয়েছিল, ইহা স্তরে তারই স্পষ্টীকরনের প্রচেষ্টা চালানো হয় জিজ্ঞাসা ও বিচারের দ্বারা। মতি জ্ঞানের তৃতীয় স্তরটি হলো 'অবায়'। এই স্তরে পূর্বের অস্পষ্ট বিষয়ের স্পষ্টীকরণ সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ বিষয়ের সাথে বিশেষণের অবগাহন হয়ে তার স্বরূপ সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ হয় এই স্তরটিতেই। মতি জ্ঞানের অন্তিম তথা সর্বশেষ স্তরটি হল 'ধারণা'। অবায়রূপ নিশ্চিত জ্ঞানের বিষয় মনে ধারণ হয় এই স্তরে। এখানে বিষয়ের একটি ছাপ তৈরি হয়, যা পরবর্তীকালে স্মৃতির সহায়ক হবে। এই চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিষয়ের অস্তিত্ব থেকে স্বরূপ এবং স্বরূপ থেকে স্মৃতি পর্যন্ত যাত্রা সুসম্পন্ন হয়।

জৈনরা মতি জ্ঞানের পরিধি আরও সম্প্রসারিত করেছেন। উমাস্বাতী প্রথম অধ্যায়ের **১৬** নং সূত্রে পূর্বোক্ত অবগ্রহ, ইহা, অবায় ও ধারণা জ্ঞানের প্রতিটির আবার 12 টি করে উপবিভাগ দেখিয়েছেন এইভাবে- "বহু বহুবিধক্ষিপ্রানিঃসৃতানুক্তধ্রুবাণাং সেতরাণাম্"[১৪], অর্থাৎ, বহু, বহুবিধ, ক্ষিপ্র, অনিঃসৃত, অনুক্ত ও ধ্রুব- এই ছয়টি এবং তাদের বিপরীত, যথা- এক, একবিধ, অক্ষিপ্র, নিঃসৃত, উক্ত ও অধ্রুব - এই ছয়টি, মোট 12 টি হল মতি

জ্ঞানের প্রতিটি স্তরের উপবিভাজন। যেহেতু মতি জ্ঞানের মোট চারটি স্তর আছে, যেহেতু ১২×৪=৪৮ টি উপবিভাগ হতে পারে। আবার যেহেতু এই প্রতিটি স্তর 5 টি ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যম প্রাপ্ত হয়, তাই ইন্দ্রিয় ও মন ভেদেও মতি জ্ঞানের সর্বমোট ৪৮×৬=২৮৮ টি বিভাজন হতে পারে। ভারতীয় অন্যান্য সকল দর্শন সম্প্রদায়ের তুলনায় জৈন দর্শনের মতি জ্ঞানের এইরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৌশল অতীব প্রশংসনীয়।

মূল্যায়ন: 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে প্রত্যক্ষের স্বরূপ ও বিভাগ এবং 'তত্ত্বার্থধিগমসূত্র' গ্রন্থে মতি জ্ঞানের স্বরূপ ও বিভাগের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে- প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে জৈনদের তুলনায় ন্যায় দর্শনের বিচার প্রণালী যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, কেননা, আমরা জানি যে ন্যায়ের ভাষা বিশ্লেষণ দক্ষতা অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের তুলনায় সর্বাধিক। প্রত্যক্ষের লক্ষণে কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহৃত হলে ঠিক কোথায় ত্রুটি ঘটতে পারতো- এই আত্মসমীক্ষা দ্বারা 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থসহ সমগ্র ন্যায় দর্শনে অতি উন্নত বিচারশৈলী লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষের স্তরভেদ দেখাতে গিয়ে নৈয়ায়িকরা দুটি স্তরে গিয়ে থেমে গেছেন- নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক। প্রথম স্তরে কোন বিষয়ের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এবং পরবর্তী স্তরে সেই বিষয়টিই স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। কিন্তু জৈন দর্শনে মতিজ্ঞানের স্তর প্রদর্শনে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যেখানে নৈয়ায়িকরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দুটি স্তর নির্দেশ করে থেমে গেছেন, সেখানে জৈনরা মতি জ্ঞানের প্রধানত চারটি স্তর দেখিয়েছেন। প্রথম স্তরে (অবগ্রহ) কোন বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেলেও, প্রত্যেকেই সেখান থেকে বিষয়ের স্পষ্টরূপের প্রতি আগ্রহী নাও হতে পারে। কেননা, আমরা সাধারণত অনেক বিষয়ই উপেক্ষা করে থাকি। জৈনরা এক্ষেত্রে বলবেন, যতক্ষণ না আমাদের মনে জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলের উদয় হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টরূপ প্রদানের প্রতি সচেষ্ট হয় না। এটি হলো মতি জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর তথা ইহা জ্ঞান। এই কৌতূহল তৃষ্ণা নিবারনের জন্য বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানের প্রয়োজন, যা মতি জ্ঞানের তৃতীয় স্তরের তথা অবায়ের প্রধান আলোচনার বিষয়। চতুর্থ স্তরে এসে সেই স্পষ্ট জ্ঞানের বীজ মনভূমিতে বপন করা হয়, যা পরবর্তীকালে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞারূপ বৃক্ষের জন্ম দেয়। এখানে বলাবাহুল্য যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সাথে মতি জ্ঞানের প্রথম স্তর তথা অবগ্রহ জ্ঞানের এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের সাথে মতি জ্ঞানের তৃতীয় স্তর তথা অবায় জ্ঞানের একটি মিল আমরা কল্পনা করতে পারি। তত্ত্বার্থসূত্রকার এখানেও থেমে থাকেননি, তিনি মতি জ্ঞানের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও মনের উপর ভিত্তি করে মতি জ্ঞানের মোট 288 টি বিভাজন করেছেন। এইরকম সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাজন শৈলী সম্ভবত জৈন ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় দর্শনে করা হয়নি।

তথ্যসূত্র:

১) Mahamahopadhyaya Gangadhar Sastri Tailanga, Nyayasutras, E.J. Lazarus & Co., Benares, Page - 11

২) শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, তর্কসংগ্রহঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, আষাঢ় ১৪২৯, পৃষ্ঠা - ৩১৩

৩) তদেব, পৃ. ৩১৩

৪) তদেব, পৃ. ৩১৩

৫) তদেব, পৃ. ৩২২

৬) তদেব, পৃ. ৩১৩

৭) Nathmal Tatia, Tattvartha Sutra That Which Is, Harper Collins, Page- 12 (9/1)

৮) Ibid, Page- 13 (11/1)

৯) Ibid, Page-13 (12/1)

১০) Ibid, Page-14 (14/1)

১১) Ibid, Page-39 (8/2)

১২) Ibid, Page-14 (13/1)

১৩) Ibid, Page-16 (15/1)

১৪) Ibid, Page-16 (16/1)

গ্রন্থপঞ্জি:

১) গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহ। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, আষাঢ় ১৪২৯, কলকাতা।

২) পোদ্দার, কানাইলাল। তর্কসংগ্রহ। ব্যানার্জি পাবলিশার্স, সর্বশেষ মুদ্রণ ২০২২-২৩, কলকাতা।

৩) বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, আগস্ট ২০১৮, কলকাতা।

৪) মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০২১, কলকাতা।

৫) শাস্ত্রী, শ্রীপঞ্চানন। তর্কসংগ্রহ। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ভাদ্র ১৩৯২, কলকাতা।

৬) Jain, Vijay K. Āchārya Umāsvami's Tattvārthsūtra. Vikalp Printers, 2011, Dehradun, Uttarakhand.

৭) Tatia, Nathmal. Tattvārtha Sūtra That Which Is. Harper Collins Publishers.

৮) Tailanga, Mahamahopadhyaya Gangadhara Sastri. Nyayasutras. E. J. Lazarus & Co., 1896, Benares.